গোলকধাঁধা

ভূঁইয়া মোহাম্মদ ইফতেখার

গোলকধাঁধা

ভূঁইয়া মোহাম্মদ ইফতেখার

জনছবি প্রকাশন

গোলকধাঁধা

ভূঁইয়া মোহাম্মদ ইফতেখার

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা, ২০১৮

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
একেএম নাসির উদ্দিন আহমেদ
জলছবি প্রকাশন, ঢাকা

অস্থায়ী কার্যালয়
১১২, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭, ০১৯১৫৬৮৪৪৩৪
Email : jalchhabi2015@gmail.com

ISBN : 978-984-93261-0-5

প্রচ্ছদ
অনিন্দ্য হাসান
মূল্য : ১৬০ টাকা

অনলাইন পরিবেশক

www.jalchhabibook.com
ফোন : ০১৮১৭১২৭৮০৭
ও
রকমারি.com
www.rokomari.com
ফোন : ১৬২৯৭.

Golokdhandha by **Bhuiyan Mohammad Iftekhar**
Published by AKM Nasiruddin Ahmed, Jalchhabi Prokashon, Dhaka.
Published in Ekushe Boimela, 2018. Price Taka 160.00, US $ 5

উৎসর্গ

তাদের সব্বাইকে, যারা লেখালেখির ব্যাপারে
আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন

ভূমিকা

উত্তম পুরুষে লেখার সুবিধা হলো লেখার সাথে নিজেকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলা যায়। আর অসুবিধা হলো লেখাটি পড়তে পড়তে পাঠকের অবচেতন মনে একটা ধারণা তৈরি হয়–এটা বুঝি লেখকের জীবনেরই গল্প! আসলে লেখক তার সব লেখাতেই কোথাও না কোথাও উপস্থিত থাকেন। এখন দেখার বিষয় হলো- নিজের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হিসেবে- 'গালকধাঁধা' সেই উপস্থিতি ছাপিয়ে কথাসাহিত্য হয়ে উঠতে পারে কি না।

এক

এই অগোছালো শহরে একপশলা বৃষ্টি স্বস্তি নয়, শঙ্কার নামান্তর। জলা, জট, যন্ত্রণা—আরও কত কী! এই মুহূর্তে আমরাও একটা শঙ্কায় আছি—বাসাটা আদৌ পাবো তো? তাগিদ অবশ্য আমারই বেশি। মেসে বলে দিয়েছি সামনের মাসে সিট ছেড়ে দেবো। নতুন মেম্বার এসে অ্যাডভান্সও করে গেছে। এখন থাকার জায়গা না পেলে একটা সমস্যায় পড়ে যাবো।

মাসুদকে অবশ্য সে তুলনায় বেশ নির্ভার মনে হচ্ছে। ও গা ছেড়ে দিয়ে হাঁটছে। এ-বাড়ি ও-বাড়ির দিকে তাকিয়ে তামাশা দেখছে। পাশের বাড়ির ব্যালকনিতে মেয়েদের একটি বক্ষবন্ধনী ঝুলছিল। আমাকে সেটি দেখিয়ে বললো, আহা, একটি নিঃসঙ্গ ব্রা!

এই ছেলের অভ্যেস আছে—হুটহাট এমন সব কথা বলে বসবে যে সেগুলো ওর রসিকতা নাকি নির্বুদ্ধিতা, চট করে বলে দেওয়া যায় না।

আমি মাসুদের দিকে তাকালাম। নীলরঙা টুইল প্যান্ট, অ্যাংরি বার্ডস ছাপার হলুদ টি-শার্ট আর প্রজাপতির ডানার মতো ছড়ানো ফ্রেমের চশমায় ওকে কোনো কার্টুন চরিত্র বলে মনে হচ্ছে। আমি রাগ করবো কি—এই বিরক্তির মাঝেও আমার হাসি চলে এলো।

ভেজা পথে নোংরা পানি। তাছাড়া রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কাজও চলছে- সাবধানে চলতে হয়। ঘন্টা দেড়েক আগে যখন বের হয়েছি, তখনও আকাশে ঝলমলে রোদ ছিল। পথ ছিল শুকনো। কিছু সময় গড়াতে না গড়াতেই দৃশ্যপট ভিন্ন।

এটা বর্ষার মৌসুম নয়, কিন্তু প্রকৃতির রূপ ক্ষণে ক্ষণে যেভাবে পাল্টাচ্ছে, মনে হচ্ছে প্রকৃতি যেন সদ্য কৈশোরে পা দেওয়া সেই মেয়েটি—যার অনুভূতিগুলো চোখের পলকে বদলে যায়।

এখন আবার একটু শীত শীত করছে।

আমরা মোড়ের টং দোকানটায় গিয়ে উষ্ণ চায়ে চুমুক দিলাম।

আশেপাশে বাড়ির সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। দেওয়ালে দেওয়ালে 'বাড়ি ভাড়া' সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনও পর্যাপ্ত। কিন্তু ওই যে—খোঁজ নিতে গেলেই জিজ্ঞেস করবে—ফ্যামিলি না

ব্যাচেলর? পেলেও পাওয়া যাবে ঘিঞ্জি নিচ তলা, নয়তো উচ্ছিষ্ট চিলেকোঠা। আমরা যে বাসাটা খুঁজছি, সেটা কেমন হবে কে জানে!

চায়ের দামটা চুকিয়ে দোকানির কাছে জানতে চাইলাম সিরাজ সাহেবের বাড়িটা কোনদিকে। সে সামনের একটা গোলাপি রঙের বিল্ডিং দেখিয়ে দিলো।

আমি মনে মনে কিছুটা আশ্বস্ত হলাম—যাক, কাছাকাছি এসে পড়েছি তাহলে। এই পর্যন্ত আসতে অনেকটা পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। বাড়িওয়ালারা যোগাযোগের জন্য এমন ফোন নম্বর কেন দেন কে জানে, যে নম্বরে তাদের সহজে পাওয়া যায় না। নইলে হয়তো ধকল আরও কিছুটা কম হতো।

গোলাপি বিল্ডিংটা ধরে যেইনা সামনে এগুতে যাবো অমনি একটি কালো বিড়াল 'ম্যাও' বলে আমাদের পথ মাড়িয়ে গেল। প্রান্তি সঙ্গে থাকলে বিষয়টা মোটেও ভালোভাবে নিতো না। বলতো, এটা অশুভ লক্ষণ। সামনে এগুনো ঠিক হবে না।

প্রান্তি সঙ্গে নেই বলে কেউ শুভ-অশুভ নিয়ে মাথা ঘামালো না।

আমরা বিল্ডিংটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নামফলকে সুন্দর করে লেখা—'নয়নতারা'। ফুলের নামে নামকরণ। একসময় সাহিত্যে কিংবা সিনেমায় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলিয়ে সেই চরিত্রের নামকরণ করার একটা প্রবণতা দেখা

যেতো। এই বাড়িওয়ালাও কি নামের সাথে মেলানোর জন্যে একে এমন অদ্ভুতভাবে গোলাপী বর্ণে রাঙিয়ে দিয়েছেন? বৃষ্টির পানিতে ভিজে সেটা এখন আরও চোখে পড়ছে।

তিনতলায় 'টু-লেট' ঝুলছে। বাড়িওয়ালারা সম্ভবত দোতলায় থাকেন। দোতলায় অন্যান্য অংশের তুলনায় যত্নের ছাপটা একটু বেশি। নিচে থেকে বাড়ির প্রশস্ত ব্যালকনিগুলো দেখা যাচ্ছে। আজকাল সচরাচর এমনটা দেখা যায় না। আমরা শুধু থাকার জায়গা চাই, ব্যালকনি আর টয়লেট খুপরীর মতো হলেও সমস্যা নেই।

বাড়িটা দেখতে দেখতে হঠাৎ কেন যেন মনে হলো এইখানে আমি আগেও এসেছি, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। স্মৃতিটা অস্পষ্ট, কেমন যেন ভাসা-ভাসা। এই অনুভূতি যে আমার এখানেই প্রথম হলো, তা নয়। আগেও হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন একটা জায়গায়, নতুন একটা পরিবেশে গিয়ে মনে হয়েছে আরে, এই জায়গা তো আমার অপরিচিত নয়! অচেনা কোন মানুষের সাথে কথা বলতে গিয়ে, কিংবা পরিচিত হতে গিয়ে মনে হয়েছে এই মানুষটিকে আগেও কোথাও দেখেছি, কথা বলেছি।

অথচ আগে কখনও এদিকে আসা হয়নি আমার। আর বাসার ব্যাপারটা জানতে পেয়েছি বাড়িভাড়ার একটি বিজ্ঞাপন থেকে। সেটাও মাস দেড়েক আগের ঘটনা। তখন বাড়িওয়ালার সাথে ফোনে কথাও হয়েছিল। এর মাঝে আমার টাইফয়েড দেখা দিল। তারপর আরও কয়েকটা বাধা। এইসব নানান কারণে আর আসা হয়নি এইদিকে। আমরা

ধরেই নিয়েছিলাম বাসাটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, সেটা এখনও ভাড়া হয়নি।

বাড়িওয়ালাকে সে কথা জিজ্ঞেস করতেই সে তার কলপ দেওয়া চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বেশ কৌশলী উত্তর দিলেন, 'বাবাজি, সব বাসা সবার পছন্দ হয় না, আবার সব বাড়ি সবার ভাগ্যেও থাকে না।'

আঙ্কেলের কথা শুনে মনে হলো তার রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় নাম লেখান উচিত। ক্রেতা বাড়ি না কিনে যাবে কই!

বাসা যথেষ্টই পছন্দ হলো।

আঙ্কেলের কৌশলী কথার কারণে নয়। কিছু বাড়ি থাকে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের অভাব—দিনের বেলাতেও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়। স্যাঁতস্যাঁতে পরিবেশ। সেই তুলনায় এ বাসাটি বেশ খোলামেলা। অ্যাটাচ বাথসহ দুইটা রুম, কম্বাইন্ড ব্যালকনি। একপাশে রান্নাঘর। পুরো ফ্লোর টাইলস্ করা। দক্ষিণমুখী জানালা। বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপনে 'মনোরম পরিবেশ' বলতে যেসবের উল্লেখ থাকে, এই বাসাটা সত্যিকার অর্থেই তেমন। তাছাড়া মেসের গাদাগাদি জীবনে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এবার নিজের রুমে আরামসে থাকা যাবে, এই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

আমি মাসুদের মতামত জানার জন্য তাকালাম। দেখলাম ও দরোজার পীপ-হোলে চোখ রেখে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করছে। আসিফের এই বন্ধুটা সত্যিই অদ্ভুত। ওকে বুঝতে আমার আরও সময় লাগবে।

আমি আঙ্কেলের হাতে অ্যাডভান্সের টাকাটা তুলে দিলাম।

বাসায় মালপত্র উঠানো পর্যন্ত মাসুদ কিছু বললো না। সব গোছগাছ শেষ হবার পর ও জানালো, বাসাটা ওর পছন্দ হয়নি।

চুলার ব্যবস্থা না হওয়ায় রাতের খাবারের জন্য হোটেলে এসেছি। একটু আয়েশ করে খাওয়ার সকল পরিকল্পনা মাটি। আমি বললাম, সেদিন যখন অ্যাডভান্স করলাম তখন তো কিছু বললা না। দরজার পীপ-হোলে কী গুপ্তধন খুঁজতেছিলা?

ও বললো, ওই পীপ-হোলেও সমস্যা আছে। বাইরের কিছু দেখা যায় না।

আমি মাসুদের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। ও ততক্ষণে অপরিচ্ছন্ন গ্লাসে পানি দেওয়া নিয়ে বেয়ারার সাথে তর্ক জুড়ে দিয়েছে। এই ছেলেকে নিয়ে বাইরে খেতে আসাও ঝামেলা। বাসনে ময়লা দাগ কেন, খাবারে চুল কেন—এইসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে হট্টগোল শুরু করে দেয়। যেন হোটেলে আসেনি, শ্বশুরবাড়িতে এসেছে!

দুই

অল্প সময়ের মধ্যেই নয়নতারার বাসিন্দাদের সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া গেল।

নিচের তলার অর্ধেকটা জুড়ে গ্যারেজের মতো, বাকি অর্ধেকটায় মোখলেস জেনারেল স্টোর। এই দোকানের মালিক মোখলেস মিয়া ক্রেতার চেয়ে নিজের মোবাইল ফোনটাকেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। তার কথা বলার যেন শেষ নেই। সেসব কথার অধিকাংশই জমিজমা, আইন-আদালত আর থানা-পুলিশ সংক্রান্ত। একান্ত প্রয়োজন না হলে এই দোকান থেকে কেউ কিছু কেনে না।

দোতলার পুরোটা বাড়িওয়ালা আর তার পরিবারের। সিরাজ সাহেবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও চুলে নিয়মিত কলপ দেন বলে বয়স কিছু কম বলে মনে হয়। বিকট শব্দে হাঁচি দিয়ে মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার অসামান্য ক্ষমতা তার রয়েছে।

এই শহরের বাড়িওয়ালারা স্বভাবের দিক থেকে বিভিন্ন বিভাজনে বিভক্ত হলেও মোটামুটি দুই শ্রেণী সচরাচর দেখা যায়। এক হলো অটোক্রাট বাড়িওয়ালা, যারা পানি অপচয় করেন কেন, ঘরবাড়ি নোংরা রাখেন কেন, ফ্লোরে এতো শব্দ হয় কেন, দেওয়ালে পেরেক ঠুকেন কেন, বাথরুমের ফিটিংস নষ্ট করেন কেন– জাতীয় প্রশ্নবাণে ভাড়াটিয়াদের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলে। এদের ভাড়াটিয়া বেশিদিন টেকে না, তাই এরা এক ভাড়াটিয়ার কাছ থেকে ভাড়া বাড়াতে পারে না, নতুন ভাড়াটিয়া ধরতে হয়। আরেক শ্রেণি হলো ডেমোক্রাট বাড়িওয়ালা, যারা প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন না বটে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, এই অজুহাতে কয়েকমাস অন্তর অন্তর বাড়িভাড়া বাড়িয়ে দেন। সিরাজ সাহেব কোন শ্রেণির তা এখনই বলা যাচ্ছে না। মাত্র কয়েকটা দিন তো গেল কেবল।

বাড়িওয়ালী আন্টির 'পরের ঘরের খবর' রাখার ব্যাপারে এলাকায় বিশেষ সুনাম আছে। নারীদের ঘরোয়া আসরে পান চিবোতে চিবোতে তিনি এমন সব তথ্য ফাঁস করে দেন যে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যায়।

তাদের ঘরে এক ছেলে এক মেয়ে।

ছেলেটাকে দেখলে মনে হয় হাতের পেশি ফুলানো আর মেয়ে পটানোই যেন ওর জীবনের একমাত্র ব্রত, আর মেয়েটা উচ্চারণ প্রতিবন্ধী। না, ভাববেন না যে কোনো জন্মগত ত্রুটির কারণে প্রতিবন্ধী হয়েছে; বরং এটাই নাকি এখনকার ফ্যাশন। শুধু বাংলা বা ইংরেজি নয়, ওকে পৃথিবীর যেই ভাষাই

শেখানো হোক না কেন, তার এমন এক উচ্চারণ বের করবে যে শুনে মনে হবে ফেভিকল খেয়ে কথা বলছে।

তিনতলার অর্ধেকটায় আমরা উঠেছি, বাকি অর্ধেকটায় যারা থাকে তাদের সঙ্গে এখনও দেখা হয়নি। দেখা না হওয়ার কারণ অবশ্য পরে ধরতে পেরেছি। আন্টির স্বামী নেই, একমাত্র সন্তানটির ডাউন সিনড্রোম। আমরা যাদের প্রতিবন্ধী বলি। আন্টি প্রয়োজন ছাড়া খুব একটা বের হন না, ছেলেকেও বের করেন না। নানান কথা শুনতে হয় তাকে।

এ ব্যাপারটি নিয়ে বাড়িওয়ালী আন্টিকে পাশের বিল্ডিংয়ের এক আন্টির সাথে এই জাতীয় কথা বলতে শুনেছি, 'আরে, আর বইলেন না ভাবী, দেখেনগে কী পাপ করছিল যে এমন সন্তান জন্ম দিছে।'

আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি, একই সন্তান যদি তার ঘরে জন্ম নিতো তাহলে তার বক্তব্য উল্টে হয়ে যেত এমন, 'আরে, আর বইলেন না ভাবী, উপরওয়ালা কারে কখন কীভাবে পরীক্ষা করে তা তো বলা যায় না।'

অন্যের জন্যে যেটা পাপ, তার জন্যে সেটা পরীক্ষা!

চারতলার অর্ধেকটা জুড়ে যে পরিবারটি থাকে তার কর্তা কলেজের প্রভাষক। সাহিত্যের বিষয় পড়ান বলেই কি না কে জানে, কৌশিক স্যার সমাজ-সংসার নিয়ে বড়ই চিন্তিত। আর সেই চিন্তায় এই মধ্যবয়সেই তার নিচের ঠোঁট গেছে ঝুলে, দেখলে মনে হয় জগতের নানান অসংগতি দেখতে দেখতে চারপাশের প্রতি তার এক ধরনের বিতৃষ্ণা চলে এসেছে।

সেইদিন দেখা হতেই বলছিলেন, 'বুঝলেন দ্বীপ সাহেব, আমাদের আসলে কোনোদিনই কাণ্ডজ্ঞান হবে না। রাস্তায় আসার পথে দেখলাম এক লোকাল বাস এক প্রাইভেট কারকে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়েছে। ড্রাইভাররা কার দোষ বেশি সেই নিয়ে রীতিমতো বিতর্কে নেমেছে! এইদিকে তাদের কারণে যে পেছনে যানবাহনের দীর্ঘ জটলা লেগে গেছে, সেই খেয়ালই নেই!'

স্যারের স্ত্রীর নাম লুবনা। সম্ভবত বৃশ্চিক রাশির জাতিকা। এদের সেন্স অব হিউমার প্রবল থাকে। তবে সবার মধ্যে সেটা প্রকাশ পায় না। লুবনা ভাবির ক্ষেত্রে পেয়েছে। খুব তুচ্ছ ঘটনাকেও লুবনা ভাবি এমন ভঙ্গিমায় বর্ণনা করেন যে না হেসে পারা যায় না।

তাদের পিচ্চিটাকে প্রায়ই দেখি ব্যালকনির গ্রিল বেয়ে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। শিশুদের আচরণের মাঝে নাকি তাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। সেই বিচারে এই পিচ্চি বড় হয়ে কী হবে- স্পাইডারম্যান?

উপরের তলার বাকি অর্ধেকটায় বদরুদ্দোজা সাহেব তার পরিবার নিয়ে থাকেন। জগতে কিছু মানুষ আছে যাদের আন্তরিকতায় প্রথম পরিচয়েই তাদের খুব আপন বলে বলে মনে হয়। বদরুদ্দোজা আঙ্কেল আর তার স্ত্রী তেমনই। তাদের একমাত্র ছেলে আনান। আনান সম্পর্কে বলতে হয়- সুবোধ বালকের যেসব বৈশিষ্ট্য থাকার কথা তার সবটাই তার মধ্যে আছে, শুধু একটি অভিযোগ ছাড়া- দুনিয়ার সব ব্যাপারেই ও নাকি মনোযোগী, শুধু নিজের পড়াশোনা ছাড়া।

সামনেই ওর এসএসসি পরীক্ষা– সবাই এ নিয়ে ভারী চিন্তিত। আমার কেন যেন মনে হয়, ও অবাক করা কিছু করবে। কারণ ওর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা প্রবল।

আনানই প্রথম আমাকে বিষয়টা অবগত করে-

'দ্বীপ ভাই, আপনি কি খেয়াল করেছেন- আপনাদের বাসায় যে আপনাআপনি জিনিসপত্রের অবস্থান নড়চড় হয়?'

সত্যি কথা বলতে আমি যে বিষয়টা খেয়াল করিনি তা না, তবে তার সবখানেই কোনো না কোনোভাবে মাসুদের সম্পৃক্ততা ছিল। এইতো সেদিন, বাসায় ফিরে দেখি আমার ট্রিমারটা মাসুদের রুমে, অথচ সেটা সবসময় আমার টেবিলের উপরে থাকে। ওকে জিজ্ঞেস করতেই ও এমন একটা ভাণ করল যেন এর কিছুই জানে না- কোনো ভূত এসে সেটা ওর রুমে রেখে গেছে। ছেলেটার যে মারাত্মক আচরণগত সমস্যা আছে, সেটা আগে বুঝিনি। আসিফের মাধ্যমে ওর সাথে পরিচয়। আসিফ অনুরোধ করেছিল বলে, নইলে এত অল্প জানাশোনায় কারও সাথে বাসা শেয়ার করার মধ্যে আমি নেই। মাসুদের মাঝে প্রবল ইনফেরিয়রিটি কমপ্লেক্স কাজ করে। ওর ধারণা, ভালো রুমটা আমি নিয়ে ওকে খারাপটা দিয়েছি। এ কারণেই এখন এসব করে এক ধরনের সমস্যা তৈরি করতে চাইছে।

সবকিছু প্রান্তিকে জানাতেই ও বললো, তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম- যে বাসায় উঠতে এতো বাধা আসছে, সেখানে না উঠাই ভালো।

আমি বললাম, আহা, তুমি তো জানো- যে কাজে বেশি বাধা আসে সেই কাজ করার ব্যাপারে আমার জেদ চেপে যায়।

আমি কোন প্রসঙ্গে কথাটা বলেছি সেটা বুঝতে পেরেই প্রান্তি চুপ করে রইল। ওর আর আমার বিয়েতে অনেক বাধা ছিল। পারিবারিক বাধা না, পারিপার্শ্বিক বাধা। সত্যি বলতে কি, এই পৃথিবীতে আমরা দুজনই এতোটা অভাগা- বিয়ের অনুমতি নেওয়ার মতো আমাদের কেউ ছিল না। কাজী অফিসে যেদিন আমাদের বিয়ে হবার কথা, সেইদিন হুট করেই শহরজুড়ে কী এক অস্থিরতা। বহুকষ্টে একটা বাহনের ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু মাঝপথে সেটাও বিকল! এর মাঝে আবার শুরু হলো ঝুম বৃষ্টি।

প্রান্তি বললো, আমার কাছে সবকিছু কেমন যেন ঠেকছে।

আমি বলল্যোম, ওসব কিছু না। সামনে আমাদের যে দীর্ঘ যুদ্ধ, এটা তার মহড়া। এখনও সময় আছে, ভেবে দেখো, আমাকে বিয়ে করবে কি না?

প্রান্তি আমার হাতটা ধরে বললো, তুমি যদি পাশে থাকার অঙ্গীকার করো, তাহলে সে যুদ্ধ আমার কাছে কিছুই না। বলো পাশে থাকবে তো?

আমি সেইদিন খুব শক্ত করে প্রান্তির হাতটা ধরে ওর চোখে চোখ রেখে বলেছিলাম, কোনো সন্দেহ!

বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছিল। তার মাঝে এই অস্থির শহরে একটি যুগল সেইদিন পরস্পরের হাতে হাত রেখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন বুনেছিল।

স্মৃতি থেকে আবার আমরা বাস্তবে ফিরে এলাম। নীরবতা ভেঙ্গে প্রান্তিই বললো, 'তারপরও, কি-না-কী সমস্যা ওই বাড়ির। আমার কাছে ভালো ঠেকছে না। অশুভ কোনো শক্তির প্রভাব থাকে যদি! ভুত-প্রেত কিংবা অন্য কিছু? তুমি এসব নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করো না তো।

ঘাটাঘাটি করলে কী হবে, অশুভ শক্তি আমার ক্ষতি করবে?

প্রান্তি সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগেই ওর সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাড়িওয়ালিকে দেখলাম ছাদে শুকোতে দেওয়া কাপড়গুলো নিতে এসেছে। উনার সামনে আমি নিজেকে খুব একটা প্রকাশ করি না। যারা অন্যের ব্যাপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, তাদের সামনে নিজেকে গুটিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ। বলা তো যায় না- এক কথা দু' কথায় এরা কোন প্রসঙ্গ বের করে আনবে, যা পরবর্তীতে আমার ক্ষতির কারণ হবে।

আমি আন্টির সঙ্গে স্বাভাবিক কুশলটুকু বিনিময় করে নিচে নেমে এলাম।

ভূত-প্রেতের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকে যাওয়ার কারণেই কি না কে জানে- সে রাতে মনে হলো আমার রুমের ভেতর কে যেন হাঁটছে। কদিন যাবৎ মাসুদ নেই, দেশের বাড়িতে

গিয়েছে। পুরো বাসায় আমি একা। অথচ এখন যেন মনে হচ্ছে আরও কেউ আছে। আলতো পায়ে সে হাঁটছে।

চারপাশ অন্ধকার। ইলেক্ট্রিসিটি চলে গেছে নিশ্চয়ই। কখন গিয়েছে কে জানে! আমার ঘুমে ছেদ পড়েছে গরমে। আর তারপর এই কান্ড।

আমি হাত বাড়িয়ে মুঠোফোনটা খোঁজার চেষ্টা করি। ওটা বালিশের পাশেই থাকে, অথচ এখন পাচ্ছি না। আশ্চর্য!

দিনের আলোতে যা স্পষ্ট, রাতের আঁধারে তা রহস্যময়। আমার চেনা পরিবেশটাও এখন কেমন যেন অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে আমি অন্য কোথাও। হঠাৎ মনে হলো কেউ যেন আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

আমি সজাগ হলাম।

আমি স্পষ্ট কারও অস্তিত্ব টের পাচ্ছি। দম বন্ধ করে অপেক্ষা করছি কী হয় তা দেখার। এমন সময় একটি মুঠোফোনের মৃদু আলো ভেসে উঠল আর তাতে আমি মাসুদের মুখটা দেখতে পেলাম।

এ কান্ড মাসুদ ছাড়া আর কেইবা করতে পারে! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

মাসুদ ব্যস্ততা দেখিয়ে বললো, লাইটারটা দিও- সিগারেট ধরাবো।

ওর নির্বুদ্ধিতায় আমার বিরক্তির আর সীমা রইল না।

তিন

মাসুদের যন্ত্রণা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছাল।

ও দরকারি জিনসপত্র হারিয়ে ফেলে। বাসার চাবি হারিয়ে বললো, জানি না। পরে সে চাবি খুঁজে পাওয়া গেলো ময়লার ঝুড়িতে। আমার আরেক সেট চাবি ছিলো বলে সেবারের মতো রক্ষা।

সবচেয়ে বড় ঝামেলাটা করলো দ্বিতীয় মাসে বাসা ভাড়া দিতে গিয়ে। ও বললো, বাসা ভাড়ার টাকা নাকি খুঁজে পাচ্ছে না। মানিব্যাগে ছিলো, এখন নেই।

অফিস থেকে কিছুক্ষণ আগে ক্লান্ত শরীরে ফিরেছি। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি খাবার নেই। সন্ধ্যায় বুয়া আসেনি নিশ্চয়ই। মেজাজটা চড়েছিল এমনিতেই। তারপর আবার এই ঝামেলা। মাসের পনেরো তারিখ, যেখানে সাত-আট তারিখের মধ্যেই বাড়িওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে দেওয়ার

চুক্তি। আগের মাসেও ওর দেরি দেখে আমি পুরো টাকা নিজের পকেট থেকে দিয়েছি, পরে ও দিয়ে দেবে বলে। আর এবার রীতিমতো টাকা হারিয়ে যাওয়ার অজুহাত। আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। ওকে রীতিমতো দু'চার কথা শুনিয়ে দিলাম।

রাতে এসব ঘটনার কারণে ঘুমোতে দেরি হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠতেও দেরি হলো। অফিসের জন্যে লেট হয়ে গেলাম। আর এই দিনগুলোতেই বাসে প্রচণ্ড ভিড় থাকে, দাঁড়ানোর জায়গা পাওয়াও কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সিএনজি পাওয়া যায় না, পেলেও নির্দিষ্ট গন্তব্যে যেতে চায় না। রাইড শেয়ারিং অ্যাপেও কোনো যান সহজলভ্য থাকে না। ভাগ্যক্রমে একটা রিকশা পেলেও যেই রাস্তায় কখনোই জ্যাম থাকে না, সেই রাস্তায়ও জ্যামে বসে থাকতে হয়।

রিকশাওয়ালাকে বললাম, আপনি গলিতে ঢুকে পড়েন, একটু ঘুরে যেতে হলেও জ্যামে বসে থাকতে হবে না।

সে রাজী হলো না।

রাজপথে রিকশা নিয়ে দাপিয়ে বেড়ানোর মাঝে এরা হয়তো এক ধরনের গৌরববোধ করে, অলি-গলিতে সেটা করে না।

ভাড়া দিতে গিয়েও আরও কিছু সময় নষ্ট হলো। রিকশাওয়ালার কাছে ভাংতি নেই। পাশের দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, তারা প্রথমে না করলেও, যখন কিছু কেনার কথা বললাম তখন দিতে রাজি হলো।

কৌশিক স্যার এখানে উপস্থিত থাকলে কী বলতেন? 'দেখলেন তো দ্বীপ সাহেব, পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কীভাবে কিছু মানুষ বাণিজ্য করে।'

শহরে এটিএম বুথগুলোর সঙ্গে টাকা ভাংতি করার ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

অফিসে প্রবেশ করতে করতে আমার কেন যেন মনে হচ্ছিল, এমডি স্যার আজ সময় মতো এসেছেন এবং ডেস্কে আমাকে না পেয়ে চটেছেন। এবং আমার কিছু কলিগ বিষয়টাকে অতিরঞ্জিত করার চেষ্টা করছে। গিয়ে দেখলামও তাই।

সকাল শুরু হলো বসের ঝাড়ি খেয়ে। এই সময়গুলোতেই মনে হয়, ধুর শালা, চাকুরিটা ছেড়ে দিয়ে নিজের একটা ব্যবসা শুরু করি। আজকাল অনেকেই করছে, একটা ফুডশপ কিংবা ফ্যাশন হাউজ। বাহারী পোশাক আর বহুপদী রান্নায় একশ্রেণি ডুবে গেলেও, আরেক শ্রেণির মাথা তুলে দাঁড়ানোর সুযোগ হয়েছে।

এমডি স্যারের রুম থেকে তাসনিম জাহানের ভৌতিক হাসির শব্দ ভেসে আসছে। হাসির ছলে বিশেষ কায়দায় শরীরের উঁচু-নিচু ভূমি প্রদর্শনের কৌশলটি তাসনিম আপার বেশ রপ্ত। ভেতরে নিশ্চয়ই সে দৃশ্য চলছে!

সামনের ডেস্কের কাশফিয়া পরশ্রীকাতর চোখে ফেইসবুকে অন্যদের কর্মকাণ্ড দেখছে। জগতের সবাই সুখে আছে, শুধু ও ছাড়া। সব ধ্বংস হয়ে যাক!

শাহেদ আর জহির একে অন্যকে 'দোস্ত' 'দোস্ত' বলে একেবারে গলে পড়ছে। কে যে কার কেমন দোস্ত, সেটা এমডি স্যারের সামনে গেলে ভালো বোঝা যায়। কৌশলে একজনের পেছনে অন্যজন যেভাবে চাকু চালায়, তা কল্পনারও অতীত।

সবকিছুই কেমন যেন বিরক্তিকর লাগছিল, কিংবা বিরক্তিকর ব্যাপারগুলোই চোখে পড়ছিল। অন্য সময় আমি এসবেই অভ্যস্ত, কিন্তু এখন কেন যেন নিতে পারছিলাম না।

ওয়াশরুমে গিয়ে বারকয়েক পানির ঝাপটা দিলাম। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব চোখে পড়ল। সেখানে ভেসে উঠল ভার্সিটির উচ্ছল ছেলেটি কর্মজীবনে এসে কেমন নিস্প্রভ হয়ে গেছে।

দিনটা ভালো গেলো না।

অফিস শেষে আসিফের রেস্তোরায় ঢুঁ মারলাম।

মাত্র ক'দিনে ও বেশ গুছিয়ে নিয়েছে নিজের ব্যবসাটাকে। ব্যতিক্রমী অন্দরসজ্জা, নিরিবিলি পরিবেশ আর ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের কারণে সন্ধ্যার এই সময়টায় এখন ব্যবসা চাঙ্গা। আমি ভেবেছিলাম আসিফ সময় দিতে পারবে না। চলেই যাচ্ছিলাম। পেছন থেকে আসিফই ডাকলো। ক্যাশে আরেকজনকে বসিয়ে আমাকে নিয়ে সোজা 'স্মোক জোনে' চলে গেল। সিগারেটের প্যাকেটটা আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললো, কাহিনী কী বলতো, তোরা যেই বাসায় উঠেছিস সেটা নাকি হন্টেড!

আমি বিরক্তি প্রকাশ করে বললাম, তোকে এ কথা নিশ্চয়ই মাসুদ বলেছে! ওর নিজেরই সমস্যা আছে। একেকটা ভুল করে আর এমন ভাণ করে যেন কিছুই জানে না। তুই কীভাবে ওর সাথে আমাকে বাসা শেয়ার করতে বলেছিলি- আমি ভেবে পাই না।

আসিফ এবার আমার কাঁধে হাত রেখে বেশ আন্তরিকতার সাথে বলে, দেখ, তুই একা একা থাকবি বলেই তোকে ওর সঙ্গে উঠতে বলেছিলাম। তাছাড়া মানছি মাসুদের আচরণে ছেলেমানুষি আছে। কিন্তু তাই বলে ও নিশ্চয়ই মিথ্যা বলছে না। সমস্যাটা হয়তো অন্য কোথাও।

কোথায়?

আসিফ সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ও কী বোঝাতে চাইছে। আগের বাসাটা আমি হুট করেই ছেড়ে দিয়েছি আমার সেখানে কিছু সমস্যা হচ্ছিল বলে। আসিফের সাথে সব ব্যাপারে কথা বললেও এ ব্যাপারটা আমি জানাইনি। ও সেটার প্রতিই ইঙ্গিত করছে।

সবকিছু কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

চার

অজানা থাকলে সামান্য ব্যাপারও আমাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে। এই যে প্রায়ই কিছু নতুন জায়গা কিংবা মানুষ আমার পরিচিত মনে হয়, তাকে যে 'দে জা ভু' বলে, এবং এটা যে চিন্তিত হবার মতো কোনো বিষয় নয়, তা একটা ওয়েব জার্নালে না গেলে জানাই হত না। আবার মাঝে মাঝেই আমরা যে মনে থাকা শব্দ বেমালুম ভুলে যাই, সেটারও যে একটা নাম আছে এবং তা হলো 'লিথোলজিকা' সেটাও অজানাই থাকতো।

সবকিছু মনস্তত্ত্ব নিয়ে। আমারটাও নয় কি? ভাবছিলাম বিষয়টা নিয়ে কোনো মনোচিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হব কি না। নেট ঘেটে দু-একটা ঠিকানাও বের করলাম। ফোনও দিলাম।

আলাদা কাস্টমার কেয়ার ছাড়া কখনোই এসব নম্বরে ফোন দিয়ে পেশাদারিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখানেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ল্যান্ডলাইন নাম্বার ব্যস্ত। মুঠোফোন

নম্বরে দুইবার ফোন দেওয়ার পর যিনি ওপাশ থেকে ফোন ধরলেন, তিনি জানালেন ডাক্তার নেই, দেশের বাইরে গিয়েছেন, এক সপ্তাহ পর ফিরবেন।

যাহ্, শুরুতেই একটা বাধা এলো।

সপ্তাহজুড়ে যারা অফিসে গাধার খাটুনি খাটে তাদের কাছে বৃহস্পতির রাতটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পরদিন সাপ্তাহিক ছুটির কথা ভেবে মনটা এমনিতেই ফুরফুরে হয়ে যায়। আর সেইদিন যদি বেতন হয়- তবে তো কথাই নেই। তখন ভাড়া নিয়ে বাস কন্ডাক্টর আর যাত্রীর ঝাঁঝাল বাক্য বিনিময়ও বিরক্তিকর লাগে না। সীট না পেয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও নিজেকে রাজা-রাজা মনে হয় কিংবা পেছনের সারিতে সীট পেলেও গিয়ে বসতে আপত্তি থাকে না। রাস্তার যানজটও সহনীয় মনে হয়।

ফুরফুরে মেজাজে বাসায় ফিরছি। দরজার লক খুলে ভেতরে ঢুকতেই বিদ্যুত চলে গেলো। ভাবলাম এই অন্ধকারে আর বাসায় বসে থেকে কী হবে! বিদ্যুত না আসা পর্যন্ত নিচে হাঁটাহাঁটি করি।

নীচে নামতেই কানে এলো মোখলেস জেনারেল স্টোরের মোখলেস মিয়া কাকে যেন অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। ঘটনা শোনার পর বুঝলাম কে যেন সদাই নিতে এসে ছেঁড়া পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে গেছে। ঠিক হয়েছে। সারাদিন ক্রেতার চেয়ে ফোনে মনোযোগ থাকে বেশি। এবার বুঝুক!

আনান ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিল, ও বললো, কী ব্যাপার দ্বীপ ভাই, নিচে কার জন্য অপেক্ষা করছেন?

ইলেক্ট্রিসিটি নেই।

লোড শেডিং হয়েছে নাকি! কই, আমাদের বাসায় তো সব ঠিকঠাক মতো চলছে।

আমি আশেপাশে ঠিকমতো তাকালাম। অনেক বাসায় আইপিএস থাকার কারণে এখন লোডশেডিং হলেও সহজে বোঝা যায় না। আমি বাসায় গিয়ে দেখলাম আমার বাসায়ও বিদ্যুত আছে। তাহলে একটু আগে যে বিদ্যুত ছিল না, সেটা কী? আমি কি ঘোরের মধ্যে আছি? আমার কি হ্যালুসিনেশন হচ্ছে?

কিছুক্ষণের জন্য মনে হলো একটু আগে যে ঘটনাটা ঘটেছে বলে আমার মনে হচ্ছিল, সেটা আসলে ঘটেইনি। পুরো ব্যাপারটা আমার কল্পনা।

দরোজা লাগাতে যাবো, দেখি আনান দাঁড়িয়ে। ওর চোখেমুখে কৌতূহল। বললো, সব ঠিকঠাক আছে তো দ্বীপ ভাই?

বুঝতে পারছি না। একটু আগেই দেখলাম বিদ্যুত চলে গেছে। তুমি বলার পর এসে দেখি সব ঠিকঠাক।

'হুমম।' আনানকে চিন্তিত মনে হলো।

আমি বললোাম, ঘটনা কী বল তো?

আনান তখন বলতে লাগলো, আপনি ঘাবড়ে যাবেন বলে সেদিন আপনাকে সব ঘটনা খুলে বলিনি। পুরো বাড়িটা ছিল দিলারা চৌধুরি নামে এক নারীর। সিরাজ সাহেব তার বড় ছেলে। আমরা যে তলায় আছি সেটি তার ছোট ছেলে মোস্তাক চৌধুরীর ছিল। স্ত্রী আর মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেটাকে নিয়ে এখানে থাকতেন তিনি। মোস্তাক চৌধুরী

খেয়ালী ধরনের মানুষ ছিলেন। বড় অভিনেতা হবার ইচ্ছে ছিল তার। কয়েকটা নাটকে অভিনয়ও করেছিলেন। কিন্তু খুব একটা নজরে আসতে পারেননি। এক ধরনের অসন্তুষ্টি থেকেই হয়ত আত্মহত্যা করেছিলেন এই ঘরেই।

আমি আনানের কথা শুনতে শুনতেই বাথরুমের সুইচ চাপলাম। কেমন যেন অস্থির লাগছিল। মুখে পানি দেওয়া দরকার। বাথরুমের সুইচে একটু সমস্যা আছে। জোরে চাপ না দিলে লাইট জ্বলে না। আবার জ্বলেও অনেক সময় মাঝ পথে নিভে যায়।

আমি টর্চটা জ্বালালাম। দেখলাম বাথরুমের আয়নায় একটা রক্তাক্ত হাতের ছাপ। এবার ধাক্কার মতো খেলাম, 'কী হচ্ছে এসব!'

আনান বললো, আবার কী হল দ্বীপ ভাই?

আমি ওকে আয়নায় হাতের ছাপটা দেখালাম। ওর চোখ বড়বড় হয়ে গেল।

এই প্রথম আমার ভেতর আতঙ্ক কাজ করল। রাতে ঘুম হল না, রাস্তার কুকুরের ডাকও অদ্ভুত মনে হল। রাতটা কোনোভাবে পার হলেই বাঁচি- এমন অবস্থা।

আমি একে একে ঘটনাগুলো দাঁড় করাতে লাগলাম। সেগুলোর ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করলাম।

পাঁচ

সকালে প্রান্তি এসে চমকে দিলো। ওর এভাবে চমকে দেওয়ার অভ্যেস আছে। কিন্তু তার পেছনে অবশ্যই কোনো না কোনো কারণ থাকে। আজকের কারণটা কী? আজ কি কোনো বিশেষ দিন? ওর কিংবা আমার জন্মদিন অথবা আমাদের বিয়ে বার্ষিকী? অফিসের নানান ব্যস্ততায় নিজের জন্মদিবসটাই কখনও কখনও স্মরণে থাকে না। গোসলের জন্যে শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম আজকের তারিখে এমন কিছু হয়েছিল কি না, যা ওর কিংবা আমার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য। কিছুই মনে পড়লো না।

গোসল শেষে বেরিয়ে দেখি প্রান্তি এর মাঝেই এতদিনের এলোমেলো রুমটাকে গুছিয়ে ফেলেছে। বিছানায় নতুন চাদর দিয়েছে। টেবিলের জিনিসপত্রগুলো সাজিয়ে রেখেছে। মেঝের একপাশে ফেলে রাখা বাসি কাপড়গুলোও এখন আর দেখছি না। ধুয়ে ফেলেছে হয়ত। আমি পোশাক পরে ভেজা

টাওয়েলটা বিছানার উপর রাখতেই ও সেটা নিয়ে গিয়ে ব্যালকনিতে টানিয়ে দিল। যাবার বেলায় আমার দিকে একটা বিরক্তিকর চাহনি দিয়ে গেল। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম- পাপোষে পা না মুছে ঘরে ঢোকা আর ভেজা টাওয়েল শুকাতে না দিয়ে বিছানায় ফেলে রাখা ওর ঘোর অপছন্দ এবং এ দু'কাজেই আমি বেশ স্বচ্ছন্দ।

ব্যালকনি থেকে রান্নাঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে প্রান্তি বলতে লাগল, আচ্ছা, তোমরা এ বাসায় কী খেয়ে থাকো বলো তো!

কেনো, কী হয়েছে?

রান্নাঘরে একটা কিছু ঠিকমতো নেই।

আমি ভেবেছিলাম ও মারাত্মক কোনো সমস্যার কথা বলবে। সমস্যা গুরুতর নয় বলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বোঝই তো, ব্যাচেলর বাসা। বুয়া রান্না করে। বলে ওর দু'গাল আলতো করে ধরে ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, তুমি এসে সংসার শুরু করলে তারপর না সব ঠিক হবে!

চোখের ভাষা সবাই বুঝে না। যারা বুঝে তাদের জন্যে সেটা সবসময় সুখকর হয় না। আমার কথার মাঝে মনের যে গভীর বিষাদটা লুকিয়ে ছিল তা হয়ত আমার চোখ দেখে বুঝে গেল প্রান্তি। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললো, হয়েছে, এবার যাও তো, কিছু জিনিস কিনে নিয়ে এসো। –বলে রান্নাঘর থেকে বাজারের থলেটা নিয়ে এসে আমার হাতে ধরিয়ে দিলো।

নিজেকে কেমন যেন টিপিক্যাল হাজব্যান্ড মনে হতে লাগল। বাজার করার অভ্যেস আমার পুরানো, তারপরও আজকের ব্যাপারটা অন্যান্য দিনের মতো নয়। বউয়ের সামনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের একটা বিষয় আছে। তাই 'দেখে-শুনে-বুঝে নিন' ধারণাটা মাথায় রাখতে হচ্ছে।

মাছের বাজারে এক দোকানীকে দেখলাম রীতিমতো চৌবাচ্চা সাজিয়ে তাজা মাছ বিক্রি করছে। আয়োজন যেমন ব্যতিক্রম, দামও তেমন চড়া। 'নিলে নেন, না নিলে সরেন'- কথা শুনে মনে হচ্ছে জীবিত মাছের এই চৌবাচ্চা রূপকথার রাজ্য থেকে নিয়ে এসেছে বিক্রেতা।

দুপুরের রান্নাটা বাসাতেই হলো।

বিকেলে প্রান্তিকে নিয়ে বের হলাম। উদ্দেশ্য শপিংমলে গিয়ে কিছু কাপড়চোপড় কেনা। কিন্তু কিছুই কেনা হলো না। কেন যেন কোনোকিছুই পছন্দ হচ্ছিল না- না প্রান্তির, না আমার। এমনটাই হয়, যখন কেনার যথেষ্ট সামর্থ্য থাকে, তখন মনমতো কিছু পাওয়া যায় না; আর যখন সামর্থ্য থাকে না তখন যা দেখি তাই-ই পছন্দ হয়ে যায়।

আমরা গোমড়া মুখ করে এস্কিলেটর দিয়ে নামছিলাম। প্রান্তি হঠাৎ গৃহশৈলীর একটি দোকানের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে বললো, 'ও মা, কী সুন্দর পর্দা!'

আমি মনে মনে বলল্যোম, কাজ সেরেছে! এই মেয়ে এবার সব টাকা পর্দা কিনেই শেষ করবে।

মজার বিষয় হচ্ছে, পর্দার কাপড়গুলো দেখে আমার গত ঈদে বাজারে আসা পাঞ্জাবীগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। দেখতে একদম একই রকম ছিল।

পর্দা দিয়ে যে কেনাকাটা শুরু হলো, তা গিয়ে শেষ হলো মসলাদানীতে। আমি প্রান্তিকে বললাম, তুমি কি আজই সংসার শুরু করে দেবে?

ও বললো, দিতেও পারি। তোমাদের ছেলেদের বিশ্বাস নেই। দেখা যাবে কাল অন্য কোনো মেয়েকে ঘরে তুলে এনে রেখেছ।

ওর ছেলেমানুষী কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

বাসায় আসার পর ও আমার রুমের চেহারাই পাল্টে দিল। প্রান্তির হাতের ছোঁয়ায় মুহূর্তেই এই ব্যাচেলর বাসাটি রীতিমতো সাজানো সংসার মনে হতে লাগল আমার।

ভালো লাগার মাঝেও হঠাৎ এক দুশ্চিন্তা আমাকে গ্রাস করল। এবং সেটা প্রান্তির চোখ এড়ালো না।

'আচ্ছা, তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

'কই, কিছু না তো!'

'কিছু একটা তো হয়েছে। তুমি এমনিতে রাস্তায় কখনই আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটো না, সবসময় আমাকে ফেলে হাঁটতে

থাকো। আমার বিরক্ত লাগে। অথচ আজ তুমি কী যেন ভাবতে ভাবতে আমার সাথেই হাঁটছিলে। রিকশায় উঠে তুমি কখনোই চুপচাপ থাকো না। একটু পরপর হাতটা পিছে নিয়ে আমাকে কাতুকুতু দিতে থাক। আজ একদম ভদ্রভাবে বসেছিলে। কিছু একটা তো হয়েছে!'

আমি কিছু বলছি না দেখে ও নিজেই অনুমান করে বললো, আচ্ছা তুমি কি বাসার ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তিত?

আমি ওর দিকে তাকিয়ে চুপ করে আছি।

প্রান্তি এবার আমার হাতটা ধরে বললো, বলো তো কী হয়েছে? প্লিজ!

অশরীরী শক্তিতে আমার বিশ্বাস নেই, অথচ এমন একটা বিষয়ই আমাকে উদ্বিগ্ন করে রেখেছে। ব্যাপারটা কেমন যেন লাগছিল। আমি প্রান্তিকে সব খুলে বললোাম।

সব শুনে প্রান্তি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর একটা তুড়ি মেরে বললো, আচ্ছা, তোমার কাছে কি ক্লোজেটের চাবি আছে?

আমি অবাক হয়ে প্রান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। ওকে কী বললাম আর ও কী বলছে!

প্রান্তি আবারও বললো, হা করে তাকিয়ে না থেকে চাবি আছে কি না বলো! আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

আমি চাবিটা এনে প্রান্তিকে দিলাম। ও সেটা বিছানার নীচে লুকিয়ে চলে গেল বাইরে। তারপর পাশের বাসার দরজা নক করতে লাগল। অনেকক্ষণ পর একজন মধ্যবয়সী মহিলা দরোজা খুললেন।

আমাকে দেখিয়ে প্রান্তি তাকে বললো, আন্টি, ওকে তো আপনি চেনেনই। আপনাদের পাশের বাসায় থাকে। আমি ওর স্ত্রী। একটা জরুরি কাজে ঢাকায় এসেছিলাম। আজই আবার চলে যাবো। কিন্তু একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। দেওয়াল আলমিরায় আমার কিছু জিনিস ও খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু বেশি যত্ন করলে যা হয় আর কী- এখন আর আলমিরার চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। এইদিকে বাড়িওয়ালাও কেউ আজ বাসায় নেই। আমি শুনেছি আপনারা আগে ওই বাসায় ছিলেন। একটু দেখুন না আন্টি, বাসার পুরানো চাবির গোছায় আলমিরার চাবিটা আছে কি না?

মহিলা কর্কশ স্বরে হাত দিয়ে ভিক্ষুক সরানোর মতো বললো, না, নাই। এখান থেকে যাও মেয়ে!

অন্য কোনো সময় হলে কারও এমন আচরণে প্রান্তি রেগে যেত এবং নির্ঘাত কিছু কথা শুনিয়ে দিত। কিন্তু ওকে দেখলাম বেশ ধৈর্যের সাথে পুরো ব্যাপারটা সামাল দিচ্ছে।

'আন্টি, দেখুন না প্লিজ। জিনিসগুলো আমার শ্বাশুড়ির দেওয়া। তার শেষ স্মৃতি।'

মহিলা এবার ঠাস করে দরজা লাগিয়ে দিলেন। প্রান্তি হতাশ হয়ে যেইনা মুখ ফিরিয়েছে অমনি আবার দরজা

খোলার শব্দ হলো, এবং সেই মহিলা একটা চাবি প্রান্তির দিকে এগিয়ে দিলেন মুখে কিছু না বলে।

প্রান্তির মুখটা তখন দেখার মতো ছিল। যেন যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে সব শুধু দেখছি। কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রান্তি ঘরে ঢুকে রুমের দরজাটা ঠিক মতো লাগিয়ে আন্টির দেওয়া চাবিটা আমাকে দেখিয়ে বললো, তোমার সব প্রশ্নের উত্তর এই চাবিতেই আছে।

মানে?

বসো, মানে বলছি। ক্লোজেটের চাবি তো আমাদের কাছে ছিলোই। আন্টির কাছে চাওয়ার উদ্দেশ্য হলো- এইটা দেখা উনার কাছে এই বাসার অতিরিক্ত কোনো চাবি আছে কি না। আমি যদি সরাসরি মূল দরজার চাবি চাইতাম, তাহলে উনি হয়ত দিতেন না। কিন্তু আলমিরার চাবি চাওয়ায়, উনি দ্বিধাগ্রস্থ হলেও কিন্তু দিয়েছেন।

ভাসুরের চাপে পড়ে তিনি স্থান ছেড়েছেন, কিন্তু অধিকার ছাড়েননি। বাড়ির এই অংশটাকে এখনও তিনি নিজের মনে করেন। এইখানে যারা থাকে তাদের তিনি অনুপ্রবেশকারী মনে করেন এবং গোপনে তাদের উপর নজর রাখেন। ইচ্ছে করে কিছু সংকট তৈরি করেন যেন তারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

বাসস্ট্যান্ডে যেতে যেতে বাকি ব্যাপারগুলোও আমার কাছে স্পষ্ট হলো।

প্রান্তির বাস ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। এইসব সমস্যা নিয়ে এতক্ষণ মাথা ভার হয়ে ছিল বলে কথাটা ওকে বলা হয়নি। এবার সুযোগ পেয়ে বললাম, আজ থেকে যাও না!

ও বললো, আজ থেকে গেলে কাল যেতে পারবো না। কাল শনিবার। তুমি তো জানো, শনিবার আমি দূরের জার্নি করি না।

কাল না হলে পরশু যাবে।

পরশু সকালে একটা পরীক্ষা আছে। আমাকে সেটা অ্যাটেন্ড করতে হবে।

আমি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

ও বললো, থেকে গেলেই বা কী হতো? মনে পড়ে আমার কথা?

না, মনে পড়ে না। সারাদিন ব্যস্ততায় ডুবে থাকি, কীভাবে মনে পড়বে! তবে...

তবে?

ওর দিকে তাকিয়ে আমি দুটো ব্যাকুল চোখ দেখতে পাই। সে ব্যাকুলতা আমার ভেতর থেকেও প্রকাশ পায়, যখন অফিস শেষে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরি আর নিজের অবসন্ন দেহটা বিছানায় এলিয়ে দেই এবং মনে হয় আমার জন্য খাবার বেরে রেখে অপেক্ষায় থাকার মত কেউ নেই- তখন তোমার কথা মনে হয়। যখন ছুটির বিকেলগুলোতে করার মত কিচ্ছু থাকে না, তখন মনে হয় আমার সাথে ঘুরতে বের হবার মত কেউ নেই, যে অনেক সময় নিয়ে সাজুগুজু করে আমাকে বোর করে দিয়ে বলবে, এবার চলো! সাইনাসের তীব্র ব্যথায় যখন মনে হয় পৃথিবীটা অর্থহীন, তখন মাথার চুলগুলো টেনে দেওয়ার মত কেউ নেই। যখন অফিসের

পুরানো শার্টটায় একটা মাকড়শা হেঁটে যায় আর আমি সেটাকে ফেলতে যাই, তখন মনে হয় পাশ থেকে কেউ যেন বললো, ওটা ফেল না, নইলে নতুন শার্ট মিস হয়ে যাবে। কোথাও ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে ভুল হলে, মনে হয় তুমি সঙ্গে থাকলে লিখে দিতে পারতে। DSLR-এ তোলা কোন যুগলের চমৎকার ছবি দেখলে মনে হয় সেই ছবিটা আমাদেরও হতে পারত। তখন তোমার কথা মনে পড়ে।

প্রান্তির চোখ ছলছল করছিল, ধরা গলায় বললো, তোমাকে কিছু বলার ছিল।

আমি বললাম, বলো।

তার আগে আমাকে এক বোতল ঠান্ডা পানি এনে দাও। গলাটা শুকিয়ে একদম কাঠ হয়ে আছে।

আমি পানির বোতল আনতে গেলাম। এর মাঝেই বাসটা ছেড়ে দিল। প্রান্তির কথাটা শোনা হলো না। আমি পানির বোতল হাতে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বাসটা যেতে যেতে দূরে মিলিয়ে গেল।

প্রান্তির কথাটা শোনা হলো না। ও হারিয়ে গেলো সময়ের স্রোতে, ঠিক সেদিনের মতো, যেদিন বাস দুর্ঘটনায় আমি ওকে এই পার্থিব জগতে হারিয়েছিলাম চিরতরে।

ছয়

বাসায় ফিরে দেখি আসিফকে নিয়ে আনান সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ওদের দেখতেই আমি এই গোলকধাঁধার ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম। সব কথা শুনে ওরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

আনান বললো, ভাইয়া, এটা কীভাবে সম্ভব!

আমি বললাম, কেন?

কারণ মোস্তাক আংকেল মারা যাওয়ার কয়েক মাসের মাথায়ই তার পরিবারকেও এ বাসা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। এই যে দেখুন তাদের দরোজায় তালা ঝুলছে।

আমি দরোজায় ঝুলতে থাকা তালাটা দেখে একটা ধাক্কার মতো খেলাম। আমার মাথায় কি সবকিছুই জট পাকিয়ে যাচ্ছে তবে!

মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

আনান আর আসিফ মিলে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আনান ওদের বাসায় যাওয়ার পর আসিফ বললো, দ্বীপ, তুই কি আবার সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিলি?

আমি ওর থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলাম। ও আমার শার্টের হাতাটা গুটিয়ে কব্জির কাটা দাগটার কাছে হাত রেখে বললো, কেন করছিস এসব? এখনও কিছুই শেষ হয়ে যায়নি তোর জীবনে। একটা এক্সিডেন্ট তোর জীবনকে এভাবে বদলে দিতে পারে না, দ্বীপ।

আমি ওর কথাগুলো শুনে যাচ্ছি, কিন্তু আমার ভেতর কোনো অনুভূতি কাজ করছে না। কেন করছে, না কে জানে!

সাত

মাঝ রাত্তিরে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কিংবা কে জানে সেটা হয়ত ঘুম ছিলই না, একটা ঘোর ছিল। কিছু কিছু রাত অতীতের দুঃসহ স্মৃতিগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়, যেই স্মৃতিগুলো হয়তো মনের গহীন কোনে লুকিয়েছিল।

আজ কেন যেন মা'র কথা খুব মনে পড়ছে। বাবাকে হারিয়েছিলাম শৈশবে, তাই তাকে ঘিরে অনুভূতিগুলো খুব একটা ডালপালা মেলতে পারেনি। মাকে ঘিরে পেরেছিল। বাবার মৃত্যুর পর আমাকে নিয়ে মা যে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা সে সময়ে বোঝার ক্ষমতা না থাকলেও এখন বুঝি।

আনোয়ার নামের এক বন্ধুর সাথে বাবা যৌথ মালিকানায় ব্যবসা করতেন। শহরে আমাদের বাসাটাও কিনেছিলেন তার সাথে যৌথভাবে। সেই আনোয়ার চাচার আচরণ যে বাবার মৃত্যুর পর আমূল পাল্টে যাবে তা আমরা ধারণাও করতে

পারিনি। তিনি কৌশলে নানান কাগজপত্র দেখিয়ে পুরো বাড়িটা নিজের বলে প্রমাণ করে ছাড়লেন। ব্যবসায় বাবা আগেই লোকসানে ছিলেন, বাড়িটাও গেলো। নানাভাই তখনও বেঁচে ছিলেন বলে আমাদের মাথার উপর একটা ছায়া ছিল। তিনি মা'কে তার ক্লিনিকের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। শুরু হলো আমাদের নতুন জীবন।

স্কুল-কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে আমি একসময় ঢাকায় চলে এলাম। টুকটাক যোগাযোগ আর কাজের প্রতি আগ্রহ থাকার সুবাদে ইন্টার্নি করা অবস্থায়ই আমার একটা চাকরি হয়ে গেলো। আমি প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম শহরে আমাদের বাসাটা উদ্ধারের। খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। কিডনিজনিত জটিলতায় আনোয়ার চাচা তখন শয্যাশায়ী। আমি নাম-পরিচয় দিতেই তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন, বড় অন্যায় করেছি বাবা তোমাদের সাথে। আজ তার শাস্তি আমি পাচ্ছি। আমাকে তোমরা ক্ষমা করে দিও–ক্ষমা করে দিও।

একটা সময় পর আমি নিজের প্রাপ্যটা বুঝে পেলাম। সেদিন স্বপ্নের মতো লাগছিল সবকিছু। আমি ভাবলাম, মাকে এখনই কিছু জানাবো না। বাসাটা গুছিয়ে তাকে সরাসরি এখানে নিয়ে এসে চমকে দেবো। আমি লেগে গেলাম কাজে। বাবা-মাকে ঘিরে আমার কত্ত-কত্ত স্মৃতি এই বাড়িতে। স্মৃতিগুলো খেলা করতে লাগল আমার ভেতর- সেগুলো কখনো আবেগপ্রবণ করে দিলো, কখনোবা এক চিলতে হাসির খোরাক জোগালো।

তারপর এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন, এবং যথারীতি আবার সেই বাধা। বাড়ি যাচ্ছি একথা জানাতে সকালে মা-কে ফোন দিতে যাবো এমন সময় আমার হাত থেকে পড়ে ফোনটা ভেঙ্গে গেল। আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এরপর জ্যাম ঠেলে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছাতে-পৌঁছাতে আধঘন্টা দেরিও হলো। ভেবেছিলাম বাস ধরতে পারব না। গিয়ে শুনি বাসও লেট। সেই বাস ছাড়ল সময় নিয়ে।

রাজধানী ছেড়ে বাসটা যখন মহাসড়ক দিয়ে ছুটে চলছে আমার মাঝে তখন এক গভীর শিহরণ, টানটান উত্তেজনা। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলাম- নিজের হারানো আশ্রয় খুঁজে পেয়ে মা'র অনুভূতি- আমি দেখতে পাচ্ছিলাম তার ছলছল চোখদুটো। বলাবাহুল্য- তখন আমিও আবেগপ্রবণ।

গন্তব্যের একদম কাছাকাছি ছিলাম আমি, আর মাত্র কিছু সময়। মা'কে পরদিনই নিয়ে আসার পরিকল্পনা ছিল আমার। কিন্তু আমি কি তখনও জানতাম আমার জন্য সেইদিন কী অপেক্ষা করছিল?

সারাটাদিন আকাশ মেঘলা হয়ে ছিল। আমি তখনও বুঝিনি সেই মেঘলা আকাশ আসলে আমার অদূরবর্তী ভবিষ্যতের পূর্বাভাস ছিল।

মা মারা গিয়েছিলেন সেদিন।

সবকিছু একদম হুট করেই। বেনু খালা আমাকে দেখতে পেয়ে বললো, তোমার ফোন বন্ধ ক্যা, সকাল থেইক্যা কতবার ফোন করছি আমি!

আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। আমি মা'র বুকে গিয়ে মাথা রাখলাম। ছোটবেলায় মা যখন আমার পাশে ঘুমিয়ে থাকতেন আর আমি তার আগে জেগে যেতাম তখন প্রায়ই মা'র বুকে মাথা রেখে আমি তার হৃদস্পন্দন শোনার চেষ্টা করতাম। বাবাকে অসময়ে হারিয়েছিলাম বলেই হয়ত মা'কে আগলে ধরে রাখার ব্যাপারটা সে বয়সে আমার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছিল। আজ সে বুকে আমি কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। আমি মা-র হাত ধরলাম। যে হাতের উষ্ণতা আমাকে পরম মমতায় জড়িয়ে রেখেছিল- আজ তা আমার পুরো পৃথিবী শীতল করে দিয়ে গেছে।

আমি 'মা' বলে চিৎকার করে উঠলাম।

মৃত্যুর মিছিল আরও দীর্ঘ হয়। বড় অসহ্য লাগছে আমার এ চার দেয়াল। সেখান থেকে যেন ধ্বনিত হচ্ছে বঞ্চিত মানুষের আর্তনাদ। কালের দেজা ভু এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা হয়ে ধরা দিয়েছে আমার সামনে। আমি আর পারছি না। মাথাটা কেমন যেন ভারভার লাগছে। খুব তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি শোয়া ছেড়ে উঠলাম। একটা কাঁপুনির মতো অনুভূত হলো। সেটা ভূমির না শরীরের স্পষ্ট নয়। কিছুদিন আগেই একটা ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে- এখন ছোটখাট কাঁপুনিতেও আতঙ্ক কাজ করে।

আমি লাইটের সুইচ চাপলাম। লাইট জ্বলছে না। ওইদিকে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। কে জানে কীসের! মাসুদ বাসায় নেই। আজকাল ঘনঘনই বাড়ি যাচ্ছে। হয়ত এ বাসায় থাকতে

সমস্যা হচ্ছে। ওর উপর অযথাই রেগেছি- এবার এলে সব ঠিক করে নিব।

কোথা থেকে যেন অবিরত কান্নার শব্দ ভেসে আসছে, চাপা কান্নার। রাস্তার কুকুরটাও করুণ সুরে ডেকে যাচ্ছে। আমি আর নিতে পারছি না।

বাসার বাইরে বের হয়ে এলাম আমি। গলি ছেড়ে রাস্তায় নামতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল আলোকসজ্জায়। কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করে এ আয়োজন হয়ত। সব উৎসবের রঙ সবার জীবনকে রঙ্গিন করে না। আমার সবকিছুই কেমন যেন বিস্বাদ লাগছে।

একটি কুকুর তার ছানাগুলো নিয়ে রাস্তার পাশে কুঁইকুঁই করছিল। শীত পেয়ে বসেছে নিশ্চয়ই। প্রকৃতির নির্মমতা হয়ত ওকে ওর ছানাগুলোর কাছে অসহায় করে দিয়েছে। আমি ওদের জন্য একটু উষ্ণতার ব্যবস্থা করার চেষ্টা শুরু করলাম।

হঠাৎ কেন যেন মনে হলো একটি ছায়া আমার পিছু নিয়েছে। আমি হাঁটলে হাঁটছে, থামলে থামছে। আমি পিছে ফিরে তাকালাম। আমার কেন যেন মনে হলো ছায়াটা প্রান্তির। এতক্ষণ ওকে ফেলে হাঁটছিলাম বলে এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সেইদিন ওর কথাটা শুনতে পারিনি বলে অভিমান করে আছে।

মানবজীবনটাও এক অদ্ভূত গোলকধাঁধা- আমরা আজীবন তার সমাধান খুঁজতে থাকি।